# অ্যারিস্টোটলের বিশ্বতত্ত্বে আঘাত হেনেছিল যাঁর আবিষ্কার
## মহাকাশের রহস্য লিখেছে বিমল বসু

সাল ১৫৬০। ইউরোপের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ ছাত্র সেই প্রথম দেখল সূর্যগ্রহণ। আর কী আশ্চর্য, সেদিন গ্রহণ শুরু হল তখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসেব করা সময় একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় মেনে। এত নিখুঁতভবে আগে থেকে বলে দেওয়া যায় গ্রহণের মতো মহাজাগতিক ঘটনা। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠল ছাত্রটি। ঠিক করে ফেলল, এরপর থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণাই হবে তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

সেই ছাত্রটিই একদিন ইউরোপের সেরা জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষক হয়ে উঠলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। পেলেন 'ইম্পিরিয়াল ম্যাথম্যাটিশিয়ন' অর্থাৎ, রাজ গণিতজ্ঞের পদ। নাম তাঁর টাইকো ব্রাহে। গ্রহগতির নিয়ম আবিষ্কারক জ্হানেস কেপলারের শুরু।

তখনকার ডেনমার্কের স্কানে শহরে (এখন ইডেনের অন্তর্গত) টাইকো ব্রাহের জন্ম ১৫৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর। বাবা অটো ব্রাহে ছিলেন রাজ-মাত্য। খুবই অভিজাত ও উচ্চবংশ তাঁদের। টাইকো অবশ্য মানুষ হয়েছিলেন কাকা জোরগেন ব্রাহের কাছে। একাই তাঁর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে মূলত জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার নেশায় তিনি উত্তর ইউরোপের ভিটেনবার্গ, স্টক, লাইপৎজিগ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই বিষয়ে মকরা সব অধ্যাপকের কাছে পড়াশোনা করেন।

ইউরোপ সফর সেরে ব্রাহে ১৫৭০ সালে ফিরে আসেন ডেনমার্কে। ১৫৭২ সালে ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডলে একটি নতুন অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র আবিষ্কার করে হইচই ফেলে দেন। আসলে সেটি ছিল 'নোভা'বা নক্ষত্র। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বলছে, নক্ষত্রের পরিবর্তনের পথেই নোভার আবির্ভাব ঘটে। সেই নক্ষত্র কে কিছুটা অংশ গ্যাসীয় মেঘের আকারে বেরিয়ে আসায় তার ঔজ্জ্বল্য কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়। নক্ষত্রটি টানা ১৮ মাস ধরে দেখা গিয়েছিল এবং ব্রাহে সে-সময় প্রায় প্রতি রাত্রেই সেটি পর্যবেক্ষণ করতেন। নিজের তৈরি যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেই নক্ষত্রের কৌণিক দূরত্ব নির্ণয়, ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তন, এমনকী রং বদলও লক্ষ করেন তিনি। এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একটি বই লেখেন। 'ডি নোভা স্টেলা'(নতুন নক্ষত্র) নামে সেই বইটি প্রকাশিত হয় ১৫৭৩ সালে।

ব্রাহের ওই নতুন নক্ষত্র আবিষ্কার সে-সময় কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মনে অ্যারিস্টোটলের বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে সংশয় জাগিয়ে তোলে। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল-এর তত্ত্বে বলা হয়েছিল, সূর্য ও গ্রহগুলি ছাড়িয়ে যে আকাশ, নক্ষত্রসমূহ তার গায়ে একেবারে স্থির, যেন চুমকির মতো বসানো। ওই আকাশের চাঁদোয়ায় কোনও পরিবর্তন নেই। কিন্তু নোভার আবির্ভাবের অর্থ অনড় নক্ষত্রের ধারণায় আঘাত হানা। ব্রাহে সেই কাজটিই করেছিলেন। ধূমকেতু নিয়েও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন ব্রাহে। ১৫৭৭ সালে খুব বড় একটি ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল। ব্রাহে তার ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত ছোট, বড়, মাঝারি নানা ধূমকেতুর ওপর দীর্ঘকালব্যাপী পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার তথ্য এবং ফলাফল নিয়ে একটি বই লেখেন তিনি। 'ডি মুণ্ডি'নামে সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৫৮৮ সালে। তাতে ব্রাহে স্পষ্টই বলেছেন যে, চাঁদ ছাড়িয়ে অনেক দূরের মহাশূন্য থেকে ধূমকেতুর উৎপত্তি। অ্যারিস্টোটলীয় ধারণায়, আকাশে যা কিছু পরিবর্তন ঘটে, সবই পৃথিবী আর চাঁদের মাঝখানে। তার বাইরে সবকিছুই অপরিবর্তনীয়। ধূমকেতু নিয়ে ব্রাহের মত স্পষ্টতই এর বিরোধী। আজ আমরা জানি প্লুটো ছাড়িয়েও অনেক দূরে সৌরমণ্ডলের একেবারে প্রান্তে 'উট ক্লাইড'নামে গ্যাসীয় মেঘময় একটি অঞ্চলে ধূমকেতুদের জন্ম। সে-দিক থেকে ব্রাহের অনুমান অনেকটাই ঠিক, এ-কথা বলা যায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে ব্রাহের খ্যাতি ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের দৃষ্টিআকর্ষণ করে। তরুণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গুণমুগ্ধ রাজা একটি মানমন্দির নির্মাণের জন্য তাঁকে কোপেনহেগেন এবং এলসিনোরের মধ্যবর্তী 'হুয়েন' দ্বীপে কিছু জমি দেন। সেইসঙ্গে নির্মাণের খরচ হিসেবে দেন এককালীন ২০ হাজার পাউন্ড। এছাড়া বেতন হিসেবে মঞ্জুর করেন বছরে ৪০০ পাউন্ড। সেই সময়ের নিরিখে প্রচুর অর্থ। হুয়েন দ্বীপে একটি ছোট পাহাড়ের ওপর মানমন্দির নির্মাণ করেন ব্রাহে। চারটি পর্যবেক্ষণাগার, একটি প্রেক্ষাগৃহ, যন্ত্রপাতি তৈরির

কারখানা, লাইব্রেরি, কর্মীদের জন্য কোয়ার্টার এবং কয়েকটি সুন্দর বাগানে সজ্জিত সাধের মানমন্দিরটির নাম দেন 'উরানিবোর্গ যার অর্থ 'স্বর্গের মন্দির'। এত বড় এবং এত উন্নত মানমন্দির সে-সময় ইউরোপে আর একটিও ছিল না। পর্যবেক্ষণাগারে যন্ত্রপাতির সমাবেশ ছিল চমকে দেওয়ার মতো। তখনকার যাবতীয় পর্যবেক্ষণ যন্ত্র ছাড়াও ছিল ব্রাহের স্ব-উদ্ভাবিত একাধিক যন্ত্র।

জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবনে বিশেষ দক্ষতা ছিল ব্রাহের। প্রচলিত যন্ত্রগুলিকেও নিখুঁত করে তুলতেন, যাতে পর্যবেক্ষণে কোনওরকম ত্রুটি না আসে। ব্রাহের সময় দূরবিন উদ্ভাবিত হয়নি। প্রচলিত যন্ত্রপাতি সংস্কার করে এবং নিজে একাধিক যন্ত্র উদ্ভাবন করে যে-ধরনের ব্যাপক ও নির্ভুল পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন ব্রাহে, এককথায় তা বিস্ময়কর। দূরবিনের সাহায্য পেলে না জানি তিনি আরও কত কিছু করতেন। বস্তুত জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণের প্রচলিত ধারাটাই বদলে দিয়েছিলেন ব্রাহে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সে-সময় চাঁদ এবং গ্রহগুলিকে (পৃথিবীকে নিয়ে মাত্র পাঁচটি গ্রহের কথা তখন জানা ছিল) পর্যবেক্ষণ করতেন কয়েকটি নির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে। ব্রাহে সারা বছর ধরে পুরো কক্ষপথেই তাদের ওপর পর্যবেক্ষণ চালাতেন। নিজে তো বটেই, উরানিবোর্গ মানমন্দিরের সহযোগীদেরও প্রায় অষ্টপ্রহর এসব কাজে ব্যস্ত রাখতেন। কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া ছিলেন টাইকো। চাঁদ ও গ্রহদের কক্ষপথে যাবতীয় অবস্থানের ওপর পর্যবেক্ষণ চালানোর ফলে তাদের চলনে এমন অনেক অসঙ্গতি ধরা পড়ে, যা ব্রাহের আগে কেউ লক্ষই করেননি।

উরানিবোর্গ মানমন্দিরে টাইকো ব্রাহে ছিলেন দীর্ঘ ২০ বছর। ২০ বছর ধরেই অনলস ছিলেন গ্রহ, নক্ষত্র ও অন্যান্য দৃশ্যমান জ্যোতিষ্কের নিখুঁত পর্যবেক্ষণে। কেবল সহযোগী এবং কর্মীদেরই নয়, শোনা যায়, পরিবারের সদস্যদেরও তিনি ওই কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ১৫৮৮ সালে ডেনমার্কের রাজা ও ব্রাহের পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের মৃত্যু হলে তাঁর জীবনে দুর্দিন নেমে আসে। পরবর্তী রাজা টাইকোর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। টাইকোর উদ্ধত ও দাম্ভিক আচরণ এবং অমিতব্যয়িতাই এর কারণ। সত্যকার জ্ঞানীগুণী ছাড়া কাউকে তিনি খাতির করে চলতেন না। পাত্তা দিতেন না পদস্থ রাজকর্মচারীদেরও। ফলে তিনি রাজসভার অনুগ্রহ হারালেন। তাঁর মাসিক বেতন ও অন্যান্য সাহায্যও বন্ধ হয়ে গেল।

তবু ব্যক্তিগত সঞ্চয় সম্বল করে আরও পাঁচ বছর উরানিবোর্গে তাঁর কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন ব্রাহে। শেষে বাধ্য হয়েই সাধের 'স্বর্গমন্দির'ছেড়ে তিনি কোপেনহেগেনে চলে আসেন এবং একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করে বাস করতে থাকেন। কিন্তু রাজরোষে সেখানেও টিকতে পারেন না। ব্রাহের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন বসে। তিনি সরকারি অর্থের অপব্যয় করেছেন এবং কাজের কাজ কিছুই করেননি বলে কমিশন রায় দেয়। ব্রাহে ডেনমার্ক ছেড়ে হামবুর্গে চলে আসেন। সেখানে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁকে আশ্রয় দেন। সেটা ১৫৯৮ সাল। তবে যিনি প্রকৃত গুণী, অজ্ঞজনদের কাছে অবহেলিত হলেও, গুণগ্রাহীর সমাদর পেতে তাঁর দেরি হয় না। ওই বছরই রোম তথা জার্মানির সম্রাট দ্বিতীয় রুডল্ফ টাইকোকে প্রাগে ডেকে পাঠান এবং সেখনে মানমন্দির তৈরির জন্য একটি বাড়ি দেন। বছরে ৩০০০ ক্রাউন বেতনেরও ব্যবস্থা করেন। টাইকো ব্রাহে 'ইম্পিরিয়াল ম্যাথম্যাটিশিয়ন'বা রাজ গণিতজ্ঞের পদে বৃত হন। ১৫৯৯ সালে নতুন মানমন্দির প্রতিষ্ঠার পর নবোদ্যমে কাজ শুরু করেন তিনি। ওই সময়েই তরুণ জ্যোতির্বিদ জোহানেস কেপলারকে তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান ব্রাহে। ব্রাহের সহযোগী হিসেবে কেপলার প্রাগের মানমন্দিরে যোগ দেন ১৬০০ সালে। তারপর ব্রাহে আর মাত্র এক বছর বেঁচেছিলেন। আর সুযোগ্য শিষ্য কেপলারের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণের যাবতীয় তথ্য তথা উত্তরাধিকার।

টাইকো ব্রাহের মূল্যবান সাহচর্য, শিক্ষা এবং অমিত তথ্যভাণ্ডারের অধিকার না পেলে কেপলার হয়তো গ্রহগতি সম্পর্কে তাঁর অমূল্য তত্ত্ব ও নিয়ম আবিষ্কার করতে পারতেন না— একথা বলে থাকেন বহু বিজ্ঞজনই।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোনও তত্ত্ব আবিষ্কার করেননি ব্রাহে। বরং গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি ধারণায় তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী। পৃথিবী গতিশীল এবং সূর্যকে পরিক্রমা করে, কোপারনিকাসের এই তত্ত্ব তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাই 'ডি মুণ্ডি' গ্রন্থে সৌরমণ্ডলের যে-পরিকল্পনা তিনি পেশ করেছেন, তাতে কেন্দ্রস্থ পৃথিবী হল স্থির, তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে চাঁদ আর সূর্য; বাকি গ্রহগুলি অবশ্য বিভিন্ন কক্ষপথে সূর্যকেই পরিক্রমণ করছে। বোঝাই যায়, টাইকো ব্রাহে টলেমি আর কোপারনিকাসের তত্ত্বের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। ব্রাহে চেয়েছিলেন তাঁর পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যগুলি কাজে লাগিয়ে কেপলার এই বিশ্বতত্ত্বকেই প্রমাণ

করুন। কিন্তু কোপারনিকাসপন্থী কেপলার গেলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তার পথে। তাঁর হাত ধরেই জন্ম নিল আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান।

তাই তাত্ত্বিক হিসেবে নয়, নিখুঁত পর্যবেক্ষণ দক্ষতা এবং যন্ত্র নির্মাণে অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতার জন্যই বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন টাইকো ব্রাহে।

রিকোলি নামক একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজানী কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে ভ্রান্তি বলে সামুদ্রিক ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। অর্থাৎ সামুদ্রিক ঝড়ে যেমন ঘর-বাড়ী তছনছ হয়ে যায়, সেইরূপ টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিক প্রচলিত বিশ্বতত্ত্বকে কোপারনিকাসের ভ্রান্ত বিশ্বতত্ত্ব তছনছ করে দিয়ে গেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী স্থির এবং সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। কেপলার (জন্ম ১৫৭১) টাইকো ব্রাহের সহকর্মী ছিলেন। তিনিও কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে সমর্থন করেন। তবে, তিনি বলেন, গ্রহদের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার (চিত্র ১০)।

ক্যানন জেশপ সেটল নামক রোমের একজন অধ্যাপক কোপর্নিকাসের মতবাদকে সত্য বলে একটি রচনা একটি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ফলে, ওই পত্রিকাটি প্রকাশের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হয়। ফিলিপ মেলান চাথোন লুথারিয়ান কলেজের একজন গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কোপার্নিকাসের মৃত্যুর ৬ বছর পরে সূর্য্য কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের বিরোধিতা করে একটা বই লিখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। ১৮ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বলেছিলেন, কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বে দিন-রাত্রি এবং ঋতু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করা যায় বটে তবে এই সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সেই সময়ে আমেরিকার ইয়েল ও হর্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বহুদিন পর্যন্ত একইসঙ্গে টলেমি ও কোপার্নিকাসের বিশ্বতত্ত্বকে সমান গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা দিয়ে এসেছিল। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে রোমান চার্চ প্রথম সরকারিভাবে ঘোষণা করে যে, এইবার হতে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে প্রকৃত ব্যাখ্যা হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা দেওয়া যাবে। কোপার্নিকাস তত্ত্বে সূর্যকে নিশ্চল কল্পনা করা হয়েছে।

**‘আইনস্টাইন? ও তো কোনো বিজ্ঞানীই নয়!’**
**লিখেছেন প্রিয়তোষ দত্ত**
**যুগান্তর, রবিবার, ৩১ অক্টোবর, ১৯৯৩**

সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে— কে সি পাল। ১ টাকা। পৃথিবীই ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে, এ কথায় বাড়াবাড়ি থাকতে পারে। কিন্তু কলকাতা ঢেকে গেছে সূর্য পৃথিবীর এই বিজ্ঞাপনে। হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদা স্টেশন, ধর্মতলা সহ সব বড় বাস! এমনকী শহরের সব সাধারণ শৌচালয় ও ল্যাম্পপোস্টে ঝুলছে কে সি পালের বিজ্ঞাপন।

কে সি পাল কি গ্যালিলও? কোপার্নিকাস? না কি পাগল? এখন কমে গেলেও সত্তর দশকের শেষ দিকে রীতিমত ঝড় তুলেছিলেন কে সি পাল। সৌরজগতে একটি চটি বই ‘বিপ্লব’ঘটাবার দুঃসাহস দেখিয়েছিল ওই বিপ্লবী দশকে। পালের সাহসে অবশ্য পৃথিবীর ‘সূর্যের চারদিকে ঘোরা বন্ধ হয়নি। সূর্যের চারপাশে আমাদের গ্রহের ফের ঘটেছে আরও অনেক বার। আরও অনেক কপি বিকিয়েছে কে সি পালের বই। হাজার হাজার কপি কিনলেন কারা? কারা পড়লেন সূর্য ঘোরার কল্প বিজ্ঞান? ছাতার কে সি পাল, লটারির কে সি পালের মতো ‘পৃথিবীকে স্থির রাখার’কে সি পালও কি বাঙালির অন্দরমহলে থাকতে পেরেছেন?

আইনস্টাইন। ও তো কোন বিজ্ঞানীই নয় অঙ্কটঙ্ক নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি। যার সবটা ও নিজেও বোঝে না। বিশ্বাসও করে না। ওঁর চিন্তায় কোনও নেই। অঙ্কটা একটু বোঝে, তার বাইরে ও একজন অন্ধ, হাতুড়ে।

এ ধরনের ভদ্র ভাষায় গালাগাল ওই সময়ে আইনস্টাইনের রোজকার খাদ্য ছিল। অধ্যাপক রেভারেন্ড জে কলহান ১৯৩১ সালে যখন বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে অবিজ্ঞানী হিসেবে প্রমাণ করাতে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে কাগুজে যুদ্ধ চালাচ্ছেন, আইনস্টাইন তখন বিজ্ঞানীর শিরোপা মাথায় নিয়েই বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। আইনস্টাইন অবশ্য এ ধরনের হাজার একটা গালাগালি সহ্য করেছেন। কলহানরা তো দলে বেশে ভারীই ছিলেন। অধ্যাপক চার্লস পুওর, আর্থার লিঙ্ক, এডওয়ার্ড মিলন, থমাস গ্রেডন, জর্জ ফ্রান্সিস গিলেট, বোথজাট— আরও কত মাথা কাজ করছিলেন এক আইনস্টাইনকেই জব্দ করতে। অবশ্য পুওর, লিঙ্ক বা মিলনের লেখাপত্তরে আইনস্টাইনের অপেক্ষাবাদের বিরুদ্ধে কিছু যুক্তিতক্কো দেওয়ার চেষ্টা আছে। আর ঠিক সে কারণেই পুওরের ‘গ্র্যাভিটেশন ভার্সেস রিলেটিভিটি’ বা মিলনের ‘কাইনেমেটিক রিলেটিভিটি’বইয়ে আগাগোড়া রয়েছে ‘বিজ্ঞানের মোড়ক।’ সাধারণ পাঠক বা বিজ্ঞানের ছাত্রদেরও মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এই সব বইয়ের। ফলে, প্রকৃতি বিজ্ঞানের জগতে বিজ্ঞানের সঙ্গে অপবিজ্ঞানের লড়াই থামেনি কখনও। আইনস্টাইন এটা জানতেন। আর তাই পুওরদের আক্রমণকে ব্যক্তিগত ভাবে গায়ে না লাগিয়ে তিনি এ যুদ্ধটাকে দেখেছিলেন বিজ্ঞানের অস্তিত্বের দিক থেকে। আইনস্টাইনের মতো সব বিজ্ঞানীই বিশ্বাস করেন, বিজ্ঞানের সঙ্গেই জুড়ে আছে অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান। সেই প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকেই।

মজার বিষয়, বিজ্ঞানের যত বেশি হাত-পা গজিয়েছে, অপবিজ্ঞানের শিকড়ও তত গেড়েছে। এমনকী সোভিয়েত দেশে যেখানে ‘সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি’ও বিজ্ঞানের চেতনার এত ঢক্কানিনাদ, সেখানেও বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানের চোলাই ভালই শুরু হয়েছে। প্যারাসাইকোলজি থেকে শুরু করে সাইকোট্রনিক্স, কম্পিউটর জ্যোতিষচর্চার রমরমা শুরু হয়েছে সে দেশগুলিতে। সারা পৃথিবীতে একই ‘ওয়র্ল্ড অর্ডার’কায়েম হয়েছে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে।

আইনস্টাইনের মতো বিশ্বজয়ী বিজ্ঞানীরা যে মানসিকতা থেকে পুওরদের মতো অপবিজ্ঞানীদের গালাগালকে হেলায় উড়িয়ে দিয়েছেন, সে মনোভাব কি লিঙ্ক-মিলনদের রয়েছে? আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায়, পুওররা আদতে এক ধরনের প্যারানয়িক মনোরোগী। প্যারানয়িক ব্যক্তির কেবলই মনে হয়, তিনি একজন বিরল প্রতিভার মানুষ। এঁরা ভাবেন, তাঁর তত্ত্বই শুধু ঠিক। আর সব ঝুটা হ্যায়। এঁরা নিজেকে ব্রুনো, গালিলিও, কোপার্নিকাসের সঙ্গে তুলনা করে তৃপ্তি পান। এবং গোটা জীবনটাই প্যারানয়িক রোগীরা কে সি পালের মতো একা একা লড়ে যান। গাঁটের কড়ি খরচ করে গাদা গাদা বই ছাপেন। রাস্তার মোড়ে বা বইমেলায় দাঁড়িয়ে, ঝুলি থেকে বার করে বই বেচেন। এই দলের বেশিরভাগ সময়ই বেছে নেয় গ্যালিলিও-র মতো বিশাল ব্যক্তিত্বকেই।

শুধু গালিলিও নন। আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাননি কোনও বড় বিজ্ঞানীই। নিউটনের সব তত্ত্বই তো কচুকাটার ভঙ্গিতে 'সাফ করে দিয়েছেন'মার্কিন বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার হল। সওয়া পাঁচশো পাতার এক থান-ইট বই লিখেছিলেন আলেকজান্ডার 'দ্য প্রবলেম অফ হিউম্যান লাইফ'। বিবর্তনের তত্ত্বও নিউটনের সব অবদানই নস্যাৎ করার এক প্রাণান্তকর চেষ্টারই নাম আলেকজান্ডার হল। নিউটনকে মচকাতে গিয়ে আলেকজান্ডার নিজেই এক নতুন তত্ত্ব খাড়া করে বসলেন। সাবস্টেনসিয়ালিজ্ম। এই তত্ত্বের আলোচনায় অলেকজান্ডার বিচারকের ভঙ্গিতে রায় দিয়েই ফেললেন, শব্দের তরঙ্গ তত্ত্ব ও করপাস্কুলার তত্ত্ব, দুটোই ভুল। তিনি যে প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের নাজেহাল করতেই বিজ্ঞানীর জোব্বা গায়ে চড়িয়েছেন, সেটা সবচেয়ে ভাল ধরা পড়ত তাঁর 'দ্য মাইক্রোজম' পত্রিকায়। নিজের পত্রিকায় একের পর এক বৈজ্ঞানিক হেঁয়ালি ও ব্যক্তিগত কুৎসা ছাপিয়ে আলেকজান্ডার নিউটন সহ তখনকার সব বিজ্ঞান-সাধককে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তেন। কোনও বিজ্ঞানীই অবশ্য তাঁর চ্যালেঞ্জের ফাঁদে পা দেননি।

**পৃথিবীকে স্থির রাখার কে সি পাল কি গ্যালিলিও? কোপারনিকাস? না কি বদ্ধপাগল? প্রকৃতি বিজ্ঞানের জগতে বিজ্ঞানের সঙ্গে অপবিজ্ঞানের এই লড়াই থামেনি কখনও। আইনস্টাইন, নিউটন, গালিলিওকে ভুল প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে অপবিজ্ঞানীর উঠেপড়ে মনগড়া তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন। কে সি পালের মতো 'প্যারানয়িক'বিজ্ঞানী (!) দের নিয়ে লিখেছেন প্রিয়তোষ দত্ত।**

আলেকজান্ডারের মতো আরেক বিজ্ঞান-তরজার কবিয়াল হলেন জোসেফ ব্যাটেল। এই মার্কিন লেখকের অ্যালেন অফ দ্য হুইসপ্যারিৎস অফ অ্যান ওল্ড পাইন' এক নিকৃষ্ট মানের বৈজ্ঞানিক বিতর্কের বই। এ বইয়েরও মূল উদ্দেশ্য শব্দ তরঙ্গের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে ফুৎকারে ওড়ানো। জোসেফ ব্যাটেলদের এই বিজ্ঞান-ব্যাটেলে রয়েছেন প্রচুর 'ভিলেন'। ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী জর্জ বোথজাট জর্জ, ফ্রান্সিস গিলেট, মার্কিন রসায়নবিদ থমাস গ্রেডন, বিজ্ঞানী ফোর্ট— আরও কত রথীমহারথী।

গিলেট তো আইনস্টাইনকে আধপাগলের বিকার। অর্থহীন প্রলাপ। পাগল। বদ্ধপাগল। পরবর্তীকালে অবশ্য বিজ্ঞানজগৎ গিলেটকেই 'পাগল' বলে সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু এ গ্রহের মানুষের কাছে গিলেট 'র্যাশনাল নন-মিস্ট্রিক্যাল কসমস' এবং 'অর্থোডক্স অক্সেন' নামে দুটি বৈজ্ঞানিক 'গপ্পের বই' রেখে গেছেন। মানতেই হবে, ওই গপ্পের বইও কিন্তু বহু বিজ্ঞান ছাত্রের মাথা খেয়েছে।

বোথজাট তো বলেই বেড়াতেন, আইনস্টাইন বিজ্ঞানের কিছু বোঝে না। কেন যে লোকে এত পাত্তা দেয় ওকে? এই কঠিন প্রশ্নের লাগসই জবাবও তৈরি রেখেছিলেন বোথজাট। 'আসলে বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষের বিজ্ঞান-মানসিকতাই হারিয়ে গেছে!' অর্থাৎ, বোথজাটরা কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাঁদের তত্ত্বকেই বিজ্ঞান বলে চালানোর। মাধ্যাকর্ষণ ও সূর্য-পৃথিবীর গতিবিধি সম্পর্কে গিলেটের 'স্পাইরাল ইউনিভার্স' তত্ত্ব, 'ব্যাক্ স্ক্রুয়িং থিওরি অফ গ্রাভিটেশন' কিংবা গ্রেভনের গ্রাভিটেশন তত্ত্ব আজগুবি সব যুক্তি আবিষ্কার করল। গ্রেভনের মতে, গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘোরে, কোনও মহাকর্ষের টানে নয়। সূর্য নিজেই গ্রহকে ঠেলা দেয় বলে! কিংবা, পৃথিবীর ওপরই কোনও জিনিস পড়ে কেন? গ্রেভনের 'বৈজ্ঞানিক'জবাব, পৃথিবীর বিকিরণ ক্ষমতা কম বলে! কলহান আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে গোড়ায় কাটতে চেয়ে রায় দিয়েছেন, ওই তত্ত্ব কোনও নন-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির ওপর দাঁড়িয়ে। আর ওই জ্যামিতিটাই তো ভুল। অতএব অপেক্ষবাদও ভুল!

তবে অপেক্ষবাদের বিরুদ্ধে অপবিজ্ঞানের কামান দাগতে গিয়ে সবচেয়ে অনাবিল মজা তৈরি করেছেন সম্ভবত ফোর্ট। অপেক্ষবাদের পরীক্ষামূলক প্রমাণপত্রের মধ্যে অন্যতম 'মাইকেলনসন মর্লি' পরীক্ষা। ওই পরীক্ষায় দেখা যায়, পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় যে-কোনও সময় আলোর গতিবেগ স্থির। প্রথমে এই পর্যবেক্ষণের কোনও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছিল না। পরে অপেক্ষবাদই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটা হাজির করে। এখন অপেক্ষবাদ ভুল হতে গেলে 'মাইকেলসন মর্লি' পরীক্ষাটি ভুল হতে হয়। কিন্তু ও পরীক্ষাটা যে সকলের চোখের সামনে দেখা। অতএব? ফোর্টের কাছে এ হেঁয়ালিকৃত জবাব তৈরি ছিল। 'হয় আইনস্টাইন ঠিক বলেছেন, নয় তো পৃথিবী ঘুরছেই না।' অবশ্য ফোর্ট বিজ্ঞানের শিকড় ধরেই প্রশ্ন করল, কে দেখাল, আলোর কোনও গতিবেগ আছে?'

হয়তো-বা ফোর্টরা এ চ্যালেঞ্জই ছুড়ে দিয়েছেন, কে বলল বিজ্ঞানের কোনও বিজ্ঞানিকতা আছে।

**আনন্দবাজার পত্রিকায় ১০ এপ্রিল ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে কার্তিক চন্দ্র পালের নতুন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রকাশিত অংশ সূর্য ঘুরছে-**

জি পি ও-র পাশের পথে গোটা কয়েক দড়ি টাঙিয়ে তাতে সৌরজগতের ভিন্ন প্রকার চন্দ্র-সূর্য পৃথিবীর গতি পথের অবস্থান নিয়ে আঁকা ছবি ঝোলানো। ইংরেজি-বাংলা ও হিন্দি ভাষায় লেখা বহু জানীগুণীর মতামতও পাশাপাশি ডিসপ্লে করে রাখা হয়েছে। কৌতূহলী জনতাকে তখন ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন হাওড়ার কে সি পাল। তাঁর মতে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, এ কথা ভুল। সূর্য্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে।

তাঁর কাছে কয়েকটি পুস্তিকাও আছে— যেগুলোতে চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবীর ৪১টি নানান ধরনের ছবি দেওয়া। সেই পুস্তিকার নীচে একটি ছোট নোট— পৃথিবীর যে-কোনও ব্যক্তি তাঁর নতুন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে-কোনও প্রশ্ন করতে পারেন। নোটে আরো লেখা ভাইকিং অভিযানের ফলাফল বেরুবির বহু আগেই নাকি তিনি জানিয়েছিলেন যে, মঙ্গল গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব নেই।

**যুগান্তর পত্রিকায় ১৬ জানুয়ারি, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে কে সি পালের যুগান্তকারী নতুন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রকাশিত অংশ।**

অ্যান্টি গ্যালিলিও-- মাঝবয়সি ভদ্রলোক। হাতে চিত্র বিচিত্র এক গোছা কাগজ নিয়ে বাসের সামনে দাঁড়িয়ে সকলকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করেন। সৌরমণ্ডলের প্রচলিত সিদ্ধান্তটি ভুল। কারণ, সূর্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। বাসে চাপা ব্যাঙ্গের গুঞ্জন-- কেউ বলল, ভদ্রলোককে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত। কেউ তাঁর হাতের ছাপা কাগজের একটা কপি চেয়ে চোখ বোলায়, কেউ শোনে কেউ শোনে না। ভদ্রলোক তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পান। তিনি নির্ভয়ে শুনিয়ে দেন তাঁর সিদ্ধান্ত। নিজে জনবহুল স্থানে দাঁড়িয়ে বই বিক্রি করেন অবিচল ধৈর্যে। তিনি আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসাতেও তাঁর বিচার ধারা লিখে পাঠিয়েছেন। অবশ্য উত্তর পেয়েছেন। তাঁর নিখুঁত দাবি— পৃথিবীর কোনও বিজ্ঞানী তাঁর নতুন থিয়োরিটিকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করতে পারবেন না। পৃথিবীর যে-কোনও ব্যক্তি তাঁর নতুন সিদ্ধান্ত বিষয়ে যে-কোনো প্রশ্নের জবাব চাইলেন তিনি দেবেন। ভদ্রলোকের নাম কে সি পাল। হাওড়ায় থাকেন। কলকাতায় যখন গ্যালিলিওর জীবন নিয়ে দুটো নাটক চলছে, তখন পাল মহাশয়ের এই নাটকও পথচারীদের কম আনন্দ দেয় না সামান্য পরসায়।

**এই সময় কলকাতা রবিবার ১১ নভেম্বর ২০১৮**

## অসম্ভব মনে হলেও সত্যি সূর্যের বার্ষিক পৃথিবী পরিক্রমণ

## আসলে পৃথিবী স্থির যাঁর দাবি তাঁকে নিয়ে ছবি

## কে সি পালে চ্যালেঞ্জ

**প্রসেনজিৎ বেরা**

লোকে উপহাস করে তাঁকে, কিন্তু তাতে থোড়াই কেয়ার কে সি পালের। নিজের তত্ত্বে তিনি অনড়— সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এ বার তাঁর জীবন নিয়ে ছবি হয়েছে। এই চলচ্চিত্র উৎসবেই সেই সিনেমা দেখানো হবে। দর্শকরা যখন ছবিটি দেখতে ঢুকবেন, ঠিক তখন বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের তত্ত্ব শোনাবেন পালমশাই। তিনি প্রমাণ করেই ছাড়বেন, গ্যালিলিও ভুল।

রবীন্দ্র সদনে সামনের রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে শুক্রবারও তিনি লিখে এসেছেন, 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে নয়, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করে।' সোমবার নজরুল তীর্থে ও মঙ্গলবার নন্দনে হাজির হবেন তিনি। দর্শকদের হাতে বিনামূল্যে এই পুস্তিকা ও লিফলেট তুলে দেবেন। ৪০-৪৫ বছর ধরে তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করে আসছেন। নিজের হাতে পোস্টার লিখে দেওয়ালে সাঁটিয়েছেন। ল্যাম্পপোস্টে কালি দিয়ে ছোট ছোট অক্ষরে লিখেছেন, পৃথিবী কোনও গ্রহ নয়, পৃথিবী হল নিভে যাওয়া নক্ষত্র। হাওড়া স্টেশন থেকে ডালহৌসি স্কোয়ার, চলন্ত বাস থেকে বইমেলা— 'সূর্যের বার্ষিক পৃথিবী পরিক্রমণ' তত্ত্বের প্রচার করে আসছেন কার্তিকচন্দ্র পাল ওরফে কে সি পাল।

কে সি পালের বই 'দ্য সান গোজ অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ ওয়াঙ্গ'নামে এই ফিল্মের নাম 'সান গোজ অ্যারাউন্ড আর্থ' রেখেছেন পরিচালক। বাড়ির প্রতি গোঁসা করে একদা রাসবিহারী মোড়ে ফুটপাথে টানা আড়াই বছর আস্তানা গেড়ে নিজের তত্ত্ব প্রচার করেছেন তিনি। অভিমান ভুলে হাওড়ার শীতলাতলার বাড়িতে ফিরে গেলেও নিজের তত্ত্বে এখনও অনড়। এই ফিল্ম তাঁর কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি বলে মনে করছেন কে সি পাল। তাঁর কথায়, 'আমাকে চিঠি লিখে কেউ বলেছে দু-পায়ের গরু। কেউ ঘুঁটের মালা পরাতে চেয়েছে। কতজন কত খোঁটা দিয়েছে। কিন্তু আমার তত্ত্বের পক্ষে আমার যুক্তি অকাট্য। এই ফিল্ম তো আমার এই কাজের স্বীকৃতি। যাঁরা এই ফিল্ম দেখতে যাবে প্রত্যেকের হাতে আমি লিফলেট তুলে দেব।'

এমন একজন মানুষকে নিয়ে কেন সিনেমা? পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কে সি পালের চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন এই ফিল্মের পরিচালক অরিজিৎ বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'যে আদর্শ মানবমুক্তির পথ দেখাবে বলেছিল, যে আদর্শকে বৈজ্ঞানিক বলে দাবি করা হয়েছিল সেই আদর্শ থেকে সরে গিয়েছেন বহু মানুষ। সেই আদর্শের প্রতি আস্থা হারিয়েছেন মানুষ। অথচ একজন ব্যক্তি যাঁর বক্তব্য আমরা জানি যৌক্তিক নয়, অথচ সেই ব্যক্তি নিজের বক্তব্যে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে আস্থা রেখেছেন। এই যে নিজের বিশ্বাসের প্রতি আস্থা এই বিষয়টিকে তুলে ধরতেই কে সি পালের চরিত্রকে অবলম্বন করা হয়েছে। যদিও ফিল্মে এই চরিত্রর নাম টি সি পাল।'

এই ছবিতে বামপন্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাসভঙ্গের কথা বলা হয়েছে। এই কারণে ফিল্মের গল্পে টি সি পালের সঙ্গে একদা বামপন্থায় বিশ্বাসী এক ফিল্মস্টারের কথোপকথনের দৃশ্য রয়েছে। যে ফিল্মস্টার নিজের যৌবনে বামপন্থার আবেগে পৃথিবী বদলে দেওয়ার কথা বলতেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেই বদলে গিয়েছেন।

ছবিতে টি সি পালের চরিত্রে অভিনয় করেছেন মেঘনাদ ভট্টাচার্য। ফিল্মস্টারের চরিত্রে রয়েছেন চিরঞ্জিত। এক ফিল্ম ডিরেক্টরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অঞ্জন দত্ত।

রাসবিহারী মোড়ে কে সি পালকে ত্রিপলের তাঁবু খাটিয়ে থাকতে দেখেছেন এই ছবির অন্যতম চিত্রনাট্যকার পারমিতা মুন্সি। তাঁর কথায়, 'খবরের কাগজে কে সি পালের কথা জানতে পেরে এবং রাসবিহারী মোড়ে প্রথম ওঁকে দেখেই স্ক্রিপ্ট লেখার ভাবনা এসেছিল। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের পর বাণিজ্যিক ভাবে এই ছবি মুক্তি পাবে।'

কে সি পালের জীবন চলচ্চিত্রের পর্দায় এলেও হাওড়ার শীতলাতলার এই বাসিন্দার জীবনচর্যায় কোনও বদল হয়নি। শনিবারও বাড়ির দাওয়ায় বসে নিজের তত্ত্বের কথা পোস্টারে লিখেছেন কে সি পাল।

দুই ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিকে নিয়ে কে সি পালের ভরা সংসার। নিজের জীবন নিয়ে তৈরি হওয়া ফিল্মের থেকে তাঁর অনেক বেশি আগ্রহ নিজের তত্ত্ব নিয়ে। তাঁর কথায়, '১৯৭৪ সাল থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে তত্ত্বের প্রচার করছি। দেওয়াল লিখতে সারা জীবনে অন্তত পাঁচ হাজার কেজির চুন কিনেছি। হাজার হাজার টাকা খরচ করে বই ছাপিয়েছি। সদ্য পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে বই ছাপিয়েছি। ফিল্ম চলুক কিংবা না-চলুক, আমি প্রচার করে যাব-- সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে।'

পালমশাইয়ের কিন্তু দম আছে।

**চিরাচরিত বৈজ্ঞানিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানানো কে সি পালের বায়োপিক**

**সন্দীপ্তা ভঞ্জ**

মঙ্গলবার ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে নন্দন চত্বরের ভিড় ছিল দেখার মতো। উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় নাগ থেকে শুরু করে ইমন চট্টোপাধ্যায়, শোভন এবং টলিউড ইন্ডাস্ট্রির আরও অনেক শিল্পীরা। এরই মাঝে পল্লবী চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন তাঁর নতুন ছবির কথা। না, কোনও বাণিজ্যিক ছবি নয়, একেবারে ভিন্ন স্বাদের এক ছবি। এক এস্ট্রোনমারের বায়োপিক। তাঁর জীবনের চড়াই-উতরাই এবং তাঁর জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞানচর্চার কাহিনিকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে ছবির গল্প।

বছরখানেক আগে গোটা শহরের বুক জুড়ে বেশ কিছু পোস্টার বেশিরভাগ মানুষকেই ধন্দে ফেলে দিয়েছিল। পোস্টারে লেখা-- সূর্য নাকি পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে। তার মানে, গ্যলিলিও থেকে শুরু করে অ্যারিস্টটল সবার হিসেব-নিকেশকেই চ্যালেঞ্জ ছোড়া! চিরন্তন হিসেবের গোটাটাই উলটপুরাণ। যা এতদিন পড়ে এসেছি তাহলে কী সবটাই ভুল! এই প্রশ্ন উঁকি দিয়েছিল অনেকেরই মনে। কেউ কেউ আবার পাগল ভেবে ভ্রূক্ষেপই করেননি সেদিকে।

অতএব যা হওয়ার তাই হল। এসব নতুন হিসেব-নিকেশ সব রয়ে গেল অন্তরালে। তবে, এবার সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হতে চলেছে সিনেমা। রুপোলি পর্দায় এই ছবি দেখে অনেকেরই হয়তো চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু, যাঁকে ঘিরে এই হইচই, তিনি কে? তাঁর নাম কে সি পাল। যিনি মহাজ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তথ্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তবে তাঁর পড়াশুনো মাত্র অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। হাওড়ার আমতার অনুলিয়া গ্রামের ব্যক্তি কে সি পালকে ঘিরে সেদিন নন্দনের লোকজনদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। একজন সাদামাটা ব্যক্তি, যাঁর পোশাক-পরিচ্ছদও একদম সাধারণ, ছেঁড়া ব্যাগ- আর এরকম একজন কীভাবে চ্যালেঞ্জ জানালেন চিরাচরিত বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাকে, সেটাই গল্পের টুইস্ট।

প্রসঙ্গত, কে সি পাল ১৯৬২-র ইন্দো-চায়না যুদ্ধের সময়ও বেশ কিছুদিন ইন্ডিয়ান আর্মির কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

**কে সি পাল**
**সুস্নাত চৌধুরী**
**আনন্দবাজার পত্রিকা**
**১৮ আগস্ট, ২০১৩**

যিনি বলেন, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। যাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করে সারা দুনিয়া। আর দুনিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যিনি জীবনটা নিংড়ে দিচ্ছেন তাঁর বিশ্বাসের জন্য। ফুটপাথে তাঁর ছাউনিটিতে ছোট ছোট পিচবোর্ড বা প্লাস্টিকের টুকরো জুড়ে জুড়ে তৈরি হয়েছে পরদা। কোনওটায় লেখা তাঁর থিয়োরি, কোনওটায় তাঁর সৌরমণ্ডলের মডেল। যেন এক বর্ম, এক রক্ষাকবচ!

এ পৃথিবীতে অন্তত একটি ঘর আছে, যে-ঘরে পৃথিবী স্থির, তাকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে সূর্য!

সাংবাদিকতার সূত্রেই বছর পাঁচেক আগেও একবার গিয়েছিলাম ওঁর বাড়ি। হাওড়া শহরে। মনে আছে, পাকা বাড়ি। সামনে কিছুটা জমি। সে সব ছেড়ে এই ফুটপাথ কেন? উত্তরে বুঝলাম, নেপথ্যে রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক সমস্যা।

'আমার জীবনের কথা লিখে কী হবে, আমার তত্ত্বটা নিয়ে লিখুন।' জানতে চেয়েছিলাম ওঁর পড়াশোনা, কাজকর্ম সম্পর্কে। দ্বিতীয়বার অনুরোধে বলতে শুরু করলেন। জন্ম হাওড়ার আমতার আনুলিয়া গ্রামে। ১৯৪২ সালে। পড়াশোনা গ্রামেই। একটু বেশি বয়সেই ভরতি হন এআরবি হাইস্কুলে। ক্লাস থ্রি-তে। পয়সার দরকার, অতএব ক্লাস এইটেই প্রথাগত শিক্ষায় ইতি। এলেন কলকাতা। কখনও মোটর-মেকানিকের কাজ, কখনও গড়িয়াহাটে আলু-পেঁয়াজ বিক্রি। এ সময়ই ডাক এল মিলিটারি থেকে। সেটা ১৯৬২। ভারত-চিন যুদ্ধ। প্রথমে উত্তরপ্রদেশের ফতেহগড়। রাজপুত রেজিমেন্টে কাটল দু'বছর। তারপর প্যারাশুট রেজিমেন্টের হাবিলদার। টানা পনেরো বছর। এই '৬২ সালেই সন্ধে বা রাতে ডিউটির সময় সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎই মনে প্রশ্ন দানা বাঁধে। চার মাস পর্যবেক্ষণের পর জোরদার হয় সন্দেহ। স্রেফ এক হাত লম্বা একটি পাইপ জানালার সঙ্গে বেঁধে চলে নজরদারি। কখনও তা ধ্রুবতারার দিকে তাক করা, কখনও সপ্তর্ষিমণ্ডলের কোনও তারার দিকে, কখনও আবার দিনের বেলায় পাইপের ফুটোয় সূর্য। প্রাপ্ত ফলের ওপর নির্ভর করে চলতে থাকে বিশ্লেষণ। দেখতে দেখতে কেটে যায় বারো বছর। ১৯৭৪ সালে তিনি নিশ্চিত হন— পৃথিবী স্থির, সূর্যই ঘুরছে তাকে কেন্দ্র করে।

হাত-টাত নেড়ে, প্রায় ডেমনস্ট্রেট করার ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছিলেন কার্তিকবাবু।

দেখছিলাম, একজন সত্তরোর্ধ্ব মানুষেরও ভয়ংকর প্রাণশক্তি থাকতে পারে। সবসময় যেন ফুটছেন। 'এই ছবিটায় আসতে আমার বারো বছর লেগে গেল। তারপর এই তত্ত্বকে যখন ভূগোল বইয়ের যে-কোনও প্রশ্ন করেছি, সব উত্তর পেয়ে গিয়েছি। এ বার আমি দেখলাম, আমার থিয়োরিটাকে দাঁড় করাতে গেলে আমাকে তো ইতিহাস জানতে হবে।'

কাশীর বৃদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রবিদ বিভূতিবাবু। বক্তৃতার মধ্যেই স্বীকার করলেন, তিনি গণিতজ্ঞ নন, জ্যোতির্বিজ্ঞানীও নন, ন্যায়বেশেষিক চিন্তার মানুষ তিনি। যুক্তিতর্ককে প্রাধান্য দেন? ওঁর মনে হয়েছে পৃথিবীর আবর্তনের ব্যাপারে নিউটনের যে সূত্র, তা মোটেই ঠিক নয়। ধ্রুবতারা যে চলমান এটাও ঠিক কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন কলকাতার বিজ্ঞানীরা। প্রথমেই উঠলেন অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়। বলেন পণ্ডিতজী আপনার ধারণা যে তত্ত্বের উপর সেই কাইনেটিমেট্রি অনেকদিন আগেই। বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে যে প্রদক্ষিণ করছে, তা নিয়ে কেপলার জলের মতো সহজ সূত্র দিয়ে গেছেন। ধ্রুবতারা শুধু চলমানই নয়, তার বর্তমান অবস্থান, তার নাম হল আলফা উরসেই মিনরিক। ৪৫০০ খ্রিস্টাব্দের যেখানে ধ্রুবতারা পৌঁছবে, সেই জায়গাটা হল গামা-সিফেই ফলে এ নিয়ে কোন দ্বিধা নেই। ডঃ অজিত কুমার সাহা বললেন : পণ্ডিতজী, আপনি পৃথিবীর কৌণিক গতিবেগের ব্যাপারটা স্বীকার করছেন না। কেপলার সূত্র অনেকদিন আগেই এ নিয়ে সহজ সমাধান করে গেছে। কাইনেটিক থিওরিতে এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহই আর নেই। বিভূতিবাবু বললেন : আপনারা যাই বলুন, আমার যুক্তি যে ভুল, সেটা প্রমাণ যুক্তি কি সেটা--

গোটা পৃথিবীর মানুষ এই মুহূর্তে যাকে নিয়ে হাসি মস্করা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তাই রাত দিন হয়। যেখানে সূর্যকে পুরোটা প্রদক্ষিণ করতে তিনশো পয়ষোট্টি দিন লাগে। তাই বছর হয়। অথচ এই পাগল বিজ্ঞানীর মতে সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে, কিন্তু বার্ষিক গতি নেই। সে কারণেই রাত-দিন হয়। আর ঋতু পরিবর্তন হয় সূর্যের বার্ষিক গতির জন্য। রাসবিহারীর মোড়ে ফুটপাথে এক চিলতে জায়গা দখল করে চর্তুরদিকে অজস্র পোস্টার ঝুলিয়ে রেখে চলছে সেই উদ্ভট তত্তের প্রচার। যা নিয়ে কোনও মানুষের মাথা ব্যাথা আছে বলেও মনে হয় না। প্রতিগন্ধময় অজস্র স্তুপাকৃত কাগজের মধ্যে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও তিনি করছেন এ অমানসিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে। ফুটপাথের ধারে এক খণ্ড প্লাসটিক সাঁটা চালা ঘরে। ভিতরে কে? জিজ্ঞাসা করতেই উঁকি দেওয়ার ভঙ্গিতে বাইরে মুখ এনে বললেন আমি কে সি পাল। যার পুরো নাম হল কার্তিক চন্দ্র পাল। কার্তিকবাবু এখানে কেন জিজ্ঞাসা করতেই তার স্পষ্ট জবাব সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এই সত্যটা যতদিন না মানুষকে বোঝাতে পারবেন ততদিন তিনি এভাবেই এখানে পড়ে থেকে তার প্রচার চালিয়ে যাবেন। যদিও এই বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণ করতে তার চেষ্টার কোনও খামতি ছিল না। যেখানে রেল স্টেশন, শিয়ালদহ, হাওড়া সেতুতে দেওয়াল লিখন থেকে পোস্টার সাঁটা সবই চলেছে দীর্ঘ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে। মিলিটারির এই প্রাক্তন কর্মীটি স্বইচ্ছায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে গত কয়েকদশক, ধরে লাগাতাড় প্রচার চালাচ্ছেন তার বিশ্বাসের সমর্থনে। যার ত্বত্তকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র নাশা..........?????

আপনি যদি আমাকে টলেমির থিয়োরি জিজ্ঞেস করেন, আর আমি বলতে না পারি, তা হলে তো আমি বেওকুফ বনে যাব। সে সময় আগ্রা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি আমাকে ফ্রি-তে নানা বইপত্র পড়ার সুযোগ দিল। চলল ক্লাস এইট ড্রপ-আউট ছাত্রের জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ। গ্যালিলিয়ো, অ্যারিস্টটল, কোপার্নিকাস, টলেমি, আর্যভট্ট...।

একই সঙ্গে তিনি শুরু করে দিলেন প্রচার। দু'মাসের ছুটিতে বাড়ি ফিরতেন। হাজার কপি করে ছাপিয়ে নিতেন তাঁর তত্ত্ব। বিলোতেন স্কুলে স্কুলে। এ সময়ই উত্তরপ্রদেশের 'অমর উজালা' সংবাদপত্রে সবিস্তার ছাপা হল তাঁর গবেষণার কথা। হল সমস্যা। বিনা অনুমতিতে সাক্ষাৎকার দেওয়ায় সার্ভিস রেকর্ডে পড়ল লাল কালির দাগ। আরও দু'বার রেড এন্ট্রির পর শো-কজ করা হল কার্তিকবাবুকে। 'আমি বলে দিলাম, চাকরি করব না, আমি কোনও জবাব দিতে চাই না। আমার প্রচারেরও অসুবিধে হচ্ছিল। নিয়ম আছে, শো-কজের এক মাসের মধ্যে জবাব না দিলে অটোমেটিক আউট করে দেওয়ার। আমাকেও আউট করে দিল। আমি খুশিই হলাম। সেটা ১৯৭৯। ফিরে এলাম। এসে, এক বছর আমি আমার বই বিক্রি করে সংসার চালিয়েছি... চার ছেলেমেয়ে... সকাল সাতটায় বেরোতাম, বারোটায় বাড়ি ফিরতাম... খেয়েদেয়ে আবার বেরোতাম, রাত দশটায় ফিরতাম। তার পর, ১৯৮০ সালে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে চাকরি পাই। রিটায়ার করি ২০০৫-এ। তখন পাঁচ লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম। আমার বউ...' সেই সম্বলটুকুও হারানোর কথা বলতে থাকেন আবার। কিন্তু সেখানে কোনও আক্ষেপ বাসা বাঁধার সময় পায় না। কেন না, ততক্ষণে আবার তিনি ঘুরে গিয়েছেন তাঁর তত্তের দিকে সেই তত্ত্ব প্রচারের নানা অভিজ্ঞতার কথা... কিছু বিশেষ জায়গায় আমি এমনিতেই বিলি করি, পয়সা নিই না। ইংলিশ বইটা ফরেনারদের জন্য ফ্রি। তবে ফরেনাররা সবাই তো আর পণ্ডিত নয় তাদের মধ্যেও আমাদের মতো গাধা আছে। কেউ হয়তো পড়তে চাইল না। নিল না-নিল, বয়ে গেল। যে নিল-- নিই থিয়োরি: দ্য সান গোজ অ্যারাউন্ড দি আর্থ ওয়াঙ্গ ইন আ ইয়ার চ্যালেঞ্জ ফর অল সায়েন্টিস্ট অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড-- ইংলিশে বলে দিলাম। এক লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ। এক জন ফুটপাতবাসীর। তাঁর ফুটপাতের বাসার গায়েই একটা বোর্ডে বড় বড় করে লেখা।

পালটা বিরোধতির মুখেও অনেক বার পড়তে হয়েছে। কখনও ফোনে হুমকি এসেছে-- মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব। কখনও চিঠি। সে সব চিঠি নিজের বইতেও ছেপেছে কার্তিকবাবু। তাঁর পাওয়া প্রথম চিঠিটি ১৯৮০ সালের ২৩ মার্চ লেখা। শুরুর দু'কথার পর প্রেরক লিখছেন-- '...আমার মনে হচ্ছে আপনি একটি দু'পেয়ে গরু। আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, আপনার গাঁজা খাওয়া কি অভ্যাস আছে? আপনার যদি নেশায় গাঁজা কম পড়ে, তা হলে দয়া করে জানাবেন। আমরা আপনার, মাথার ছিট ছাড়াবার জন্য সযত্নে গাঁজা পাঠিয়ে দেব।' আবার, ৩/৪/৮১ তারিখে আর একজন তাঁকে লিখছেন-- '...একটি কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা

হয় যে আপনি কি রাঁচীর পাগলখানার একজন প্রাচীন সভ্য ছিলেন? তাহা না হইলে এই ধরনের মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা কোথা হইতে আসিল? অতএব আমরা ইহাই সাব্যস্ত করিলাম যে, আপনি গাঁজা খাইয়া থিয়োরিটি উদ্ভাবন করিয়াছেন, অতএব আপনার প্রাপ্য পুরস্কার হল একটি সুদীর্ঘ ঘুঁটের মালা।' আবার প্রচারের সময় সরাসরি প্রতিবাদের সামনেও পড়তে হয়েছে। কেউ সরব হয়েছে বইমেলায় তাঁর ক্যানভাসিং-এর সময়, কেউ চলতি বাস থেকে তাঁকে নামিয়ে দিতে চেয়েছে। কখনও আবার প্রতিবাদ আরও দু-এক ডিগ্রি কড়া। 'এক বার দু'জন আমাকে, বলল, প্রোফেসরের কাছে নিয়ে যাব। বলে, চিন যুদ্ধ। প্রথমে উত্তরপ্রদেশের ফতেহগড়। রাজপুত রেডিমেন্টে কাটল দু'বছর। তারপর প্যারাশুট রেজিমেন্টের হাবিলদার। টানা পনেরো বছর।

মা মারা যাওয়ার পরে গ্রামের বাড়িটাও বিক্রি করে দিই এক আত্মীয়কে। সেখানেও আশি হাজার পাঁচশো টাকা পাওনা। আড়াই বছর হয়ে গেল, কিন্তু আমি চুপ করে আছি, দেখি কবে দেয়।

ফুটপাথের একটি ছাউনি মাত্র, কিন্তু নিজের আইডিয়ায় তাকে গড়ে তুলেছেন কার্তিকবাবু। চার দিকে কোনও প্লাস্টিক শিট কিংবা তেরপল দিয়ে বানানো দেওয়ালের আপাত সুরক্ষা নেই। বরং ছোট ছোট পিচবোর্ড বা প্লাস্টিকের টুকরো জুড়ে জুড়ে তৈরি হয়েছে পরদা। কোনওটায় লেখা তাঁর থিয়োরি, কোনওটায় তাঁর সৌরমণ্ডলের মডেল, কোনওটায় আমাজনতার উদ্দেশে বক্তব্য, আবার কোনওটায় বিজ্ঞানীদের প্রতি তির্যক মন্তব্য। নিজের তত্ত্ব দিয়েই নিজের ঘর গড়েছেন তিনি। আক্ষরিক ভাবেই নিজের আইডিয়ার ভেতর বেঁচে রয়েছেন। যেন সেই বিদেশি ছবিতে দেখা পাদরির ঘর, যে ঘরের দেওয়াল জুড়ে সাঁটা বইবে‌েলের পাতা। যেন এক বর্ম টাকা খরচ করে আসতে পারবে না? আমি রাস্তায় থাকি, এখানে অনেক পাতাখোর গাঁজাখোর ঘুরে বেড়ায়। তাদের এক দিন কম পড়লে, হয়তো আমাকে মেরে দিয়ে ফোনটা নিয়ে চলে যাবে। তখন, আমার এই আবিষ্কারের কী হবে? ফোন-টোন আমার চাই না। তবু, রাতে শোওয়ার সময় আমি মাথার কাছে একটা ছুরি নিয়ে শুই...'

সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে
সুস্নাত চৌধুরী
আনন্দবাজার পত্রিকা

সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবী মোটেই তার চারদিকে ঘুরছে না— ওয়ান ফাইন মর্নিং এই সহজ কথাটা সত্যি হয়ে দেখা দিলে আমার-আপনার কৌন সা মহাভারত অশুদ্ধ হবে? দিনের বেলা ট্রেনে সেই একই রকম ভিড় থাকবে... রাতের বেলা মিনিমাম তিন পেগ না হলে ঘুম আসবে না... মাস ফুরোলে মাইনে চার আনা বাড়বে না... বছর ঘুরলে অন্যের ইনক্রিমেন্ট দেখে আগের মতোই জ্বলুনি ধরবে... যেমন খাচ্ছেন, বাথরুম যাচ্ছেন, মাঝে মাঝে শুচ্ছেন, চকচকে ব্লেডে দাড়ি কামাচ্ছেন কিংবা পিরিয়ড এলে কষ্ট পাচ্ছেন, শীতকালে পিকনিক করছেন, গ্রীষ্মকালে ঘামছেন— অবিকল তেমনটাই চলতে থাকবে। আপনি ইশকুলের ভগোল টিচার না হলে, জাস্ট কিচ্ছু যাবে-আসবে না। অথচ সেই মানুষটাকে আমি দেখেছি, আপনারাও অনেকে দেখেছেন, স্রেফ এই একটা কারণে নিজের জীবনটা যিনি খরচ করে দিয়েছেন। আপাতত ঘর-বাড়ি-পেনশন হারিয়ে গত দু'বছর ধরে কলকাতার ফুটপাতে দিন কাটাচ্ছেন। রাত কাটাচ্ছেন।

'পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে, কিন্তু বার্ষিক গতি নেই। আহ্নিক গতি আছে বলেই দিন-রাত্রি হয়। আর ঋতু পরিবর্তন হয় সূর্যের বার্ষিক গতির জন্য।' রাসবিহারী মোড়ে ফুটপাথের ওপর বসে বলছিলেন কার্তিকবাবু। কার্তিকচন্দ্র পাল। কে সি পাল। হাওড়া স্টেশন চত্বর কিংবা কলকাতার বহু দেওয়ালে, ব্রিজে, ল্যাম্পপোস্টে, দেওয়ালে যাঁর গ্রাফিত্তি আপনারা দেখেছেন। নিজের হাতের লেখায় তাঁর তত্ত্বের ওয়ান-লাইনার, বা ছবি-টবি দিয়ে ভাল করে এঁকে তত্ত্বটার বিশদ ব্যাখ্যা। কৌতূহলবশে বইমেলা থেকে নগদ দশ টাকা বা খুচরো এক টাকায় হয়তো বা তাঁর থিসিসও সংগ্রহ করেছেন।

ই-নাগরিকরা হয়তো গুগল-বুকস-এ তাঁর বইটির নাম দেখে থাকবেন। এর পর বাকিটা আপনার মনে হতেই পারে... 'বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি/জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।/ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—/সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হিং টিং ছট্।'

কথা হচ্ছিল সেই কে সি পাল-এর সঙ্গে। পাশেই তাঁর থাকার জায়গা। থাকার জায়গা মানে, নিদেনপক্ষে নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালির যে দশ ফুট বাই দশ ফুট জোটে, তা-ও নয়। ফুটপাথের রেলিংয়ের সঙ্গে বাঁধা, মাথা আর কুঁকড়ে-মুকড়ে দেহ গোঁজার একটা ঠাঁই। চওড়া বড়জোর দু'-আড়াই ফুট, লম্বাতেও ছ'-সাত ফুটের বেশি হবে না। শুয়ে পড়লে, পাশ ফেরার জায়গাটুকুও মেলা দায়। এর ভেতরেই সব কিছু। রান্নাবান্না, পড়াশোনা। এখানেই কে সি পালের রোজকার দিনরাত্রি, সারা বছরের ঋতু পরিবর্তন।

ফুটপাথের একটি ছাউনি মাত্র, কিন্তু নিজের আইডিয়ায় তাকে গড়ে তুলেছেন কার্তিকবাবু। চারদিকে কোনও প্লাস্টিক শিট কিংবা তেরপল দিয়ে বানানো দেওয়ালের আপাত সুরক্ষা নেই। বরং ছোট ছোট পিচবোর্ড বা প্লাস্টিকের টুকরো জুড়ে জুড়ে তৈরি হয়েছে পরদা। কোনওটায় লেখা তাঁর থিয়োরি, কোনওটায় তাঁর সৌরমণ্ডলের মডেল, কোনওটায় আমজনতার উদ্দেশে বক্তব্য, আবার কোনওটায় বিজ্ঞানীদের প্রতি তির্যক মন্তব্য, নিজের তত্ত্ব দিয়েই নিজের ঘর গড়েছেন তিনি। আক্ষরিক ভাবেই নিজের আইডিয়ার ভেতর বেঁচে রয়েছেন। যেন সেই বিদেশি ছবিতে দেখা পাদরির ঘর, যে-ঘরের দেওয়াল জুড়ে সাঁটা বাইবেলের পাতা। যেন এক বর্ম, এক রক্ষাকবচ— যেন এ ঘরে কোনওক্রমেই না ঢুকে পড়তে পারে শয়তান! এ পৃথিবীতে অন্তত একটি ঘর আছে, যে-ঘরে পৃথিবী স্থির, তাকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে সূর্য!

সাংবাদিকতার সূত্রেই বছর পাঁচেক আগেও একবার গিয়েছিলাম ওঁর বাড়ি। হাওড়া শহরে। মনে আছে, পাকা বাড়ি। সামনে কিছুটা জমি। সে সব ছেড়ে এই ফুটপাথ কেন? উত্তরে বুঝলাম, নেপথ্যে রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক সমস্যা। হয়তো রয়েছে তাঁর এই একান্ত ব্যক্তিগত 'সত্য'র পিছনে সব কিছু ভুলে ছুটে চলাও। এই 'পাগলামি' আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! প্রতি মাসে পেনশনের কয়েক হাজার টাকাও নাকি তিনি আর হাতে পান না। জোটে মোটে পাঁচশো টাকা। 'ইচ্ছে করলে কোর্টে যেতে পারতাম, কিন্তু সে আমি পছন্দ করি না।' তা হলে চলে কী করে? হাসতে হাসতে বুঝিয়ে দিলেন কার্তিকবাবু— 'মাসে পাঁচশো মানে, দিনে সতেরো টাকার মতো করে দাঁড়াচ্ছে। মোটামুটি খরচ ওতেই চলে যায়। দু'টাকা লাগে সকালে চা খেতে, দু'টাকা লাগে পায়খানা করতে। নস্যির জন্য সামান্য খরচ। বাকি টাকায় রান্নাবান্না। এ ছাড়াও তো বই বিক্রির টাকা থেকে লাভ থাকে।'

আমার বেসিক-পিএফ-ইএমআই-মুদিখানার, জটিল সুদকষায় অভ্যস্ত মস্তিষ্কে এত সরল পাটিগণিত ঢুকছিল না। তিনি বলতে থাকেন— 'মা মারা যাওয়ার পরে গ্রামের বাড়িটাও বিক্রি করে দিই এক আত্মীয়কে। সেখনেও আশি হাজার পাঁচশো টাকা পাওনা। আড়াই বছর হয়ে গেল, কিন্তু আমি চুপ করে আছি, দেখি কবে দেয়। এখন যদি আমি ঝগড়ার মধ্যে যাই, আমার প্রচারের কাজটায় ভাটা পড়ে যাবে।'

আমি একটু কেয়ারিং হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কিন্তু ফুটপাথে এ ভাবে থাকাটা কতটা সেফ?' কার্তিকবাবু বলেন, 'আমি তো এ সব খুলে রেখেই চলে যাই। তবে হ্যাঁ, আমার মোবাইলটা এখান থেকেই চুরি হয়ে গিয়েছে। তার পর দু'জন আমাকে ফ্রি-তে ফোন দিতে চেয়েছে, বইমেলায়। আমি নিইনি। কেননা, যার ইন্টারেস্ট থাকবে, সে আমার কাছে আসবে। আমি যদি এত পরিশ্রম করে থাকি, এত পয়সা খরচ করে থাকি, সে দুটো মিনিট আর দশ-বিশ টাকা খরচ করে আসতে পারবে না? আমি রাস্তায় থাকি, এখানে অনেক পাতাখোর গাঁজাখোর ঘুরে বেড়ায়। তাদের এক দিন কম পড়লে, হয়তো আমাকে মেরে দিয়ে ফোনটা নিয়ে চলে যাবে। তখন, আমার এই আবিষ্কারের কী হবে? ফোন-টোন আমার চাই না। তবু, রাতে শোয়ার সময় আমি মাথার কাছে একটা ছুরি নিয়ে শুই...'

'আমার জীবনের কথা লিখে কী হবে, আমার তত্ত্বটা নিয়ে লিখুন।' জানতে চেয়েছিলাম ওঁর পড়াশোনা, কাজকর্ম সম্পর্কে। দ্বিতীয় বার অনুরোধে বলতে শুরু করেলন। জন্ম হাওড়ার আমতার আনুলিয়া গ্রামে। ১৯৪২ সালে। পড়াশোনা গ্রামেই। একটু বেশি বয়সেই ভরতি হন এআরবি হাইস্কুলে। ক্লাস থ্রি-তে। পয়সার দরকার, অতএব ক্লাস এইটেই প্রথাগত শিক্ষায় ইতি। এলেন কলকাতা। কখনও মোটর-মেকানিকের কাজ, কখনও গড়িয়াহাটে আলু-পেঁয়াজ বিক্রি। এ সময়ই ডাক এল মিলিটারি থেকে। সেটা ১৯৬২। ভারত-চিন যুদ্ধ। প্রথমে উত্তরপ্রদেশের ফতেহগড়। রাজপুত রেজিমেন্টে কাটল দু'বছর। তারপর প্যারাশুট রেজিমেন্টের হাবিলদার। টানা পনেরো বছর। এই '৬২ সালেই সন্ধে বা রাতে ডিউটির সময় সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎই মনে প্রশ্ন দানা বাঁধে। চার মাস পর্যবেক্ষণের পর জোরদার হয় সন্দেহ। স্রেফ এক হাত লম্বা একটি পাইপ জানালার সঙ্গে বেঁধে চলে নজরদারি। কখনও তা ধ্রুবতারার দিকে তাক করা, কখনও সপ্তর্ষিমণ্ডলের কোনও তারার দিকে, কখনও আবার দিনের বেলায় পাইপের ফুটোয় সূর্য! প্রাপ্ত ফলের ওপর নির্ভর করে চলতে থাকে বিশ্লেষণ। দেখতে দেখতে কেটে যায় বারো বছর। ১৯৭৪ সালে তিনি নিশ্চিত হন— পৃথিবী স্থির, সূর্যই ঘুরছে তাকে কেন্দ্র করে।

হাত-টাত নেড়ে, প্রায় ডেমনস্ট্রেট করার ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছিলেন কার্তিকবাবু। দেখছিলাম, এক জন সত্তরোর্ধ্ব মানুষেরও কী ভয়ংকর প্রাণশক্তি থাকতে পারে। সবসময় যেন ফুটছেন। 'এই ছবিটায় আসতে আমার বারো বছর লেগে গেল। তার পর এই তত্ত্বকে যখন ভূগোল বইয়ের যে-কোনও প্রশ্ন করেছি, সব উত্তর পেয়ে গিয়েছি। এ বার আমি দেখলাম, আমার থিয়োরিটাকে দাঁড় করাতে গেলে আমাকে তো ইতিহাস জানতে হবে।

আপনি যদি আমাকে টলেমির থিয়োরি জিজ্ঞেস করেন, আর আমি বলতে না পারি, তা হলে তো আমি বেওকুফ বনে যাব। সে সময় আগ্রা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি আমাকে ফ্রি-তে নানা বইপত্র পড়ার সুযোগ দিল।' চলল ক্লাস এইট ড্রপ-আউট ছাত্রের জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ। গ্যালিলিয়ো, অ্যারিস্টটল, কোপার্নিকাস, টলেমি, আর্যভট্ট...। একই সঙ্গে তিনি শুরু করে দিলেন প্রচার।

দু'মাসের ছুটিতে বাড়ি ফিরতেন। হাজার কপি করে ছাপিয়ে নিতের তাঁর তত্ত্ব। বিলোতেন স্কুলে স্কুলে। এ সময়ই উত্তরপ্রদেশের 'অমর উজালা' সংবাদপত্রে সবিস্তার ছাপা হল তাঁর গবেষণার কথা। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে তা আসতেই শুরু হল সমস্যা। বিনা অনুমতিতে সাক্ষাৎকার দেওয়ায় সার্ভিস রেকর্ডে পড়ল লাল কালির দাগ। আরও দু'বার রেড এন্ট্রির পর শো-কজ করা হল কার্তিকবাবুকে। 'আমি বলে দিলাম, চাকরি করব না, আমি কোনও জবাব দিতে চাই না। আমার প্রচারেরও অসুবিধে হচ্ছিল। নিয়ম আছে, শো-কজের এক মাসের মধ্যে জবাব না দিলে অটোমেটিক আউট করে দেওয়ার। আমাকেও আউট করে দিল। আমি খুশিই হলাম। সেটা ১৯৭৯। ফিরে এলাম। এসে, এক বছর আমি আমার বই বিক্রি করে সংসার চালিয়েছি... ... চার ছেলেমেয়ে... সকাল সাতটায় বেরোতাম, বারোটায় বাড়ি ফিরতাম... খেয়েদেয়ে আবার বেরোতাম, রাত দশটায় ফিরতাম! তারপর, ১৯৮০ সালে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে চাকরি পাই। রিটায়ার করি ২০০৫-এ। তখন পাঁচ লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম। আমার বউ...' সেই সম্বলটুকুও হারানোর কথা বলতে থাকেন আবার। কিন্তু সেখানেও কোনও আক্ষেপ বাসা বাঁধার সময় পায় না। কেন না, ততক্ষণে আবার তিনি ঘুরে গিয়েছেন তাঁর তত্ত্বের দিকে। সেই তত্ত্ব প্রচারের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন।

'এখন তো শুধু দু'ঘণ্টা লেকচার করি। বাসে বাসে। সকাল ন'টা থেকে এগারোটা। দু'ঘণ্টায় আমি পঞ্চাশ টাকার বিক্রি করে দেব। তাও তো এখন দাম কমিয়ে দিয়েছি। এক টাকা আর পাঁচ টাকা। আগে দশ টাকা ছিল, এখন পাতা কমিয়েছি। পুরো ইতিহাস দিলে আমার খরচ বেড়ে যাচ্ছিল। মানুষ তো মোদ্দা জিনিসটা জানতে চায়। ইতিহাস তারা জানতে চায়, যারা আমার সঙ্গে তর্ক করবে। তারা তো ইতিহাস পড়লেই জানতে পারবে, আমার বই পড়ার দরকার নেই। তা ছাড়া কিছু কিছু বিশেষ জায়গায় আমি এমনিতেই বিলি করি, পয়সা নিই না। ইংলিশ বইটা ফরেনারদের জন্য ফ্রি। তবে ফরেনাররা সবাই তো আর পণ্ডিত নয়, তাদের মধ্যেও আমাদের মতো গাধা আছে! কেউ হয়তো পড়তে চাইল না। নিল না-নিল, বয়ে গেল! যে নিল—নিউ থিয়োরি: দ্য সান গোজ অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ ওয়ান্স ইন আ ইয়ার, চ্যালেঞ্জ ফর অল সায়েন্টিস্ট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড— ইংলিশে

বলে দিলাম।' এক লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ। এক জন ফুটপাথবাসীর। তাঁর ফুটপাথের বাসার গায়েই একটা বোর্ডে বড় বড় করে লেখা!

পালটা বিরোধিতার মুখেও অনেক বার পড়তে হয়েছে। কখনও ফোনে হুমকি এসেছে— মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব। কখনও চিঠি। সে সব চিঠি নিজের বইতেও ছেপেছেন কার্তিকবাবু। তাঁর পাওয়া প্রথম চিঠিটি ১৯৮০ সালের ২৩ মার্চ লেখা। শুরুর দু'কথার পর প্রেরক লিখছেন— '...আমার মনে হচ্ছে আপনি একটি দু'পেয়ে গরু। আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, আপনার গাঁজা খাওয়া কি অভ্যাস আছে? আপনার যদি নেশায় গাঁজা কম পড়ে, তা হলে দয়া করে জানাবেন। আমরা আপনার মাথার ছিট ছাড়াবার জন্য সযত্নে গাঁজা পাঠিয়ে দেব।' আবার, ৩/৪/৮১ তারিখে আর একজন তাঁকে লিখছেন— 'একটি কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে আপনি কি রাঁচীর পাগলখানার একজন প্রাচীন সভ্য ছিলেন? তাহা না হইলে এই ধরনের মস্তিষ্কের উর্বরতা কোথা হইতে আসিল? অতএব আমরা ইহাই সাব্যস্ত করিলাম যে, আপনি গাঁজা খাইয়া থিয়োরিটি উদ্ভাবন করিয়াছেন, অতএব আপনার প্রাপ্য পুরস্কার হল একটি সুদীর্ঘ ঘুঁটের মালা।' আবার প্রচারের সময় সরাসরি প্রতিবাদের সামনেও পড়তে হয়েছে। কেউ সরব হয়েছে বইমেলায় তাঁর ক্যানভাসিংয়ের সময়, কেউ চলতি বাস থেকে তাঁকে নামিয়ে দিতে চেয়েছে। কখনও আবার প্রতিবাদ আরও দু'-এক ডিগ্রি কড়া। "এক বার দু'জন আমাকে বলল, প্রোফেসরের কাছে নিয়ে যাব। বলে, লালবাজারে ধরে নিয়ে গেল। লালবাজার বলল— এটা আমাদের আন্ডারে নয়। তার পর নিয়ে গেল হেয়ার স্ট্রিট থানায়। সেখানে ডায়েরি লিখল। অফিসার বলল— 'আরে, এনার একটা বক্তব্য আছে, বলছেন। আপনাদের ভাল লাগে শুনুন, না হলে শুনবেন না। আপনাদের তো জোর করে কেউ দিচ্ছে না বইটা।' আমায় ছেড়ে দিল। আর এক বার হয়েছিল শিয়ালদার কাছে। একজন প্রোফেসর জনা দশেক ছাত্র এনেছে। আমি তখন আমেরিকা থেকে আসা চিঠিগুলো ঝুলিয়ে রাখতাম। ওরা চেষ্টা করছিল কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলার। আমি ছিঁড়তে দিইনি, আমাকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে গেল শিয়ালদার কাছে একটা পুলিশ ফাঁড়িতে। অফিসারকে বললাম— আমি একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছি, সেটাই প্রচার করছি, এরা আমায় ফালতু ধাক্কা মেরে এখানে নিয়ে এল। অফিসার বললেন— দেখুন, আপনি একা, এরা দশ জন। আপনি আর অসবেন না এখানে। আমি বললাম— ঠিক আছে। বলে, কেটে পড়লাম। আর যেতাম না ওখানে। এক বছর অন্তর এক দিন করে যেতাম, পর দিন দল বেঁধে এলেও আমাকে আর দেখতে পেত না!'

কে সি পাল-কে আমার তখন ফ্যাতাড়ু মনে হচ্ছে। রাষ্ট্রের কাছে একটা চোরা থ্রেট। পাগল-ছাগল ইমেজের একটা মানুষ রাসবিহারীর ফুটপাথ থেকে গোটা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। তাবৎ বিজ্ঞান যখন 'ঘোরো ঘোরো ঘোরো' বলে পৃথিবীর নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে, তিনি উলটো দিকের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে এককথায় 'স্টপ' বলে সব থামিয়ে দিচ্ছেন। আর মাঝে মাঝে আঙুল তুলে বলছেন, 'একটা ছবি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি আমার থিয়োরির ভুল ধরার, পারিনি। কারও ক্ষমতা নেই এর ভুল ধরার।' তাঁর কথায় কথায় রাম-শ্যাম-যদুর মতো উঠে আসছেন টলেমি, কোপার্নিকাস, পিথাগোরাস, অ্যারিস্টটল, কেপলার। অনায়াসে কাউকে উড়িয়ে দিচ্ছেন, কেউ কিঞ্চিৎ নম্বরও পাচ্ছেন। 'কোপার্নিকাস, গ্যালিলিয়ো ভুল করেছিলেন, সেই ভুলটাই এখন পৃথিবীর পাঁচশো কোটি মানুষ পড়ছে। আমার থিয়োরিটা যে দিন স্বীকৃতি পাবে, সে দিন পৃথিবীর পাঁচশো কোটি মানুষ আমার কথাটাই মানবে।'

ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, একটা প্রশ্ন ওঁকে করা হল না— দেওয়ালে, পোস্টারে উনি শুধু সাদা আর কোলো রং-ই কেন ব্যবহার করেন? খরচের কারণে? না কি সাদা-কালোর বৈপরীত্যটা আসলে সত্য আর মিথ্যার মতোই বলে। একটা লড়াই— ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের। হ্যাঁ বনাম না। চল্লিশ বছর হতে চলল, যে লড়াইয়ে তিনি একাই একটা পক্ষ। উলটো দিকে আমি, আপনি, মনমোহন সিংহ, বারাক ওবামা, বিড়লা তারামণ্ডল, কেনেডি স্পেস সেন্টার— সব্বাই। গোটা দুনিয়া। তবু এক দিন এক মুহূর্তের জন্যও এতটুকু দুর্বল হয়ে পড়েননি ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই প্রাক্তন সদস্যটি। তিনি জানেন, তাঁকে নিয়ে সর্বত্র ব্যঙ্গ করা হয়। আড়ালে নয়, সামনেই লোকে হাসে, বইমেলায় ঘিরে ঘিরে হ্যারাস, করে, কখনও তাঁর প্রচার শুনে খিস্তি মেরে চলে যায়, তবু সমান তেজ নিয়ে লড়ে গিয়েছেন তিনি। সামান্য ট্যারা কথা, তা সে শাশুড়ির মুখ থেকেই হোক

বা বসের মুখ থেকে— বঙ্গললনা আর বাঙালি বীরপুঙ্গবদের আধরাতের ঘুম কেড়ে নিয়ে। সেই জাতে এমন এক মানুষ সত্যিই বিরলতম, যিনি হাজারও অপমান, যাবতীয় বাধা সত্ত্বেও নিজের প্রতিপাদ্যে অবিচল থাকতে পারেন বছরের পর বছর।

তত্ত্বটা ঠিক না ভুল, সত্যিই 'নাসা' এক দিন তার কথা মেনে নেবে কি না, ছেড়ে দিন। সেই লোকটার কথা ভাবুন, যাঁর ছেলেমেয়েরা অবধি স্কুলে গিয়ে যা পড়ে আসছে, তা তাদের বাবার কথাকে সরাসরি প্রলাপ বলে প্রমাণ করে। তবু সেই লোকটা তাঁর বিশ্বাস থেকে এক চুলও সরছেন না। সবচেয়ে বড় কথা, সেই বিশ্বাসটা শুধু তক্তপোশে শুয়ে শুয়ে লালন করলে চলে না। সেটা প্রচারের জন্য গোটা শহর জুড়ে নিজের হাতে লেখাগুলো লিখতে হয়, পাতাগুলো নিজের গাঁটের কড়ি খসিয়ে ছাপতে হয়, বাস্তব পৃথিবীতে সরাসরি গলার শির ফাটিয়ে তো জোরে জোরে বলতে হয়। জীবনের প্রতিটি দিন মাস বছর মুহূর্ত, শরীর মন শক্তি আশা, সব এই একটা প্রোজেক্টে নিংড়ে নিংড়ে খরচা করে ফেলতে হয়। এবং এই সমস্তটাই করতে হয় পুরোপুরি জেনে, যে পৃথিবীতে এক জনও তাঁর পক্ষে নেই, এক জনও না, এবং গলা দিয়ে রক্ত উঠে এলেও এক জনও তাঁর পক্ষে চলে আসার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এই রকম প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়ে একটা লোক একাত্তর বছর বয়সে এতটুকু অপ্রসন্ন নন। একটা কথাতেও কোনও হতাশা ধরা পড়ে না। ক্রোধ, ক্ষোভ, বিলাপ, আর্তনাদ— যা প্রায় সব বাঙালি নিত্য ভাতে মেখে প্রায়, তা তাঁর মধ্যে প্রবেশাধিকারই পায়নি। তিনি জান লড়িয়ে দিচ্ছেন শুধু তাঁর তত্ত্বটা আঁকড়ে। অন্তত এই জায়গায়, ডেডিকেশন আর টেনাসিটির প্রশ্নে, তিনি আমাদের ইতিহাসর অতিমানবিক চরিত্রগুলির সঙ্গে তুলনীয় নন কী? তিনি লড়াইটা কি গ্যালিলিয়োর চেয়ে কম লড়ছেন? তিনি আরও অপেক্ষা করতে রাজি। তাঁর স্থির বিশ্বাস, এক দিন না একদিন তিনি জিতবেনই। না, কথাটা ঠিক হল না— তিনি জানেন, এই লড়াইয়ে সৃষ্টির আদি থেকেই তিনি জিতে রয়েছেন। তাঁর তত্ত্বই ষোলো আনা অভ্রান্ত, নির্ভুল। এই বিশ্বাসই তাঁর পুঁজি। এই বিশ্বাসে ভর করেই তিনি বেঁচে রয়েছেন। তাঁর এই বেঁচে থাকার চেয়ে বড় সত্যি আর কিছু নেই। আসলে কে-কার চারদিকে ঘুরল, তাতে শেষ অবধি কিস্যু যায়-আসে না।

সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে

গত ৪০ বছর ধরে যে-ভদ্রলোক তাঁর এহেন বিশ্বাসে অটল, সেই কে সি পাল-কে নিয়ে এবার ছবি। বানাবেন 'এজেন্ট বিনোদ'-এর লেখক অরিজিৎ বিশ্বাস। লিখছেন ভাস্বতী ঘোষ—

২০১৬-য় বাংলা ছবিতে দুটো ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটেছে। ১, এ বছর শহরের নামী পরিচালকদের অধিকাংশ যখন প্রথমবার মন দিলেন হিন্দি ছবিতে, ঠিক তখনই বলিউডে নামী ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকা কিছু বাঙালি পরিচালক/চিত্রনাট্যকার শহরে এসে তাঁদের নতুন বাংলা ছবির তোড়জোড় শুরু করছেন। যেসব ছবি শুরু হবে ২০১৭-র গোড়ায়। ২, এইসব পরিচালকেদের ছবির বিষয়ের দিকে চোখ রাখলে বোঝা যাচ্ছে, বাঙালি জীবনের অঙ্গ, এমন কোনও বিষয় বা মানুষকে বড় পর্দায় নিয়ে আসছেন তাঁরা।

কিছুদিন আগেই যেমন 'গুলাব গ্যাং' পরিচালক সৌমিক সেন 'অন্য সময়'-এ ঘোষণা করেছেন তাঁর নতুন ছবি 'মহালয়া'। আর আজকে যে নতুন ছবি নিয়ে এই লেখা, তার সঙ্গে জড়িত নামটি অরিজিৎ বিশ্বাস। অরিজিৎ বলিউডে 'এজেন্ট বিনোদ' ছবির গল্পের অন্যতম লেখক। বাংলায় 'ছায়ামানুষ' লেখার সঙ্গে জড়িত তিনি। তবে সবচেয়ে বেশি নাম করেছেন 'হদলাপুর' ছবির অন্যতম চিত্রনাট্যকার হিসেবে। আর এবার আসছেন ছবি পরিচালনায়। ভাবনা বছর দুই আগের। গোয়ায় জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে এনএফডিসি-র স্ক্রিন রাইটার ল্যাবে নির্বাচিত হয়েছে তাঁর চিত্রনাট্য। ইফির মতো নামী ফেস্টিভ্যালে নির্বাচিত হওয়ার পর মেন্টরের নির্দেশে চিত্রনাট্যে অরিজিৎ ঘষামাজা করেছেন। এবার শ্যুটিং ফ্লোরে যাওয়ার তোড়জোড়। এতদিন ধরে চিত্রনাট্যচর্চার কারণ হয়তো একটাই। ছবির বিষয়। অরিজিৎ বলছেন, 'এটা পলিটিক্যাল ছবি। ছবির গল্পে যে-মানুষটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, তিনি কে সি পাল। বাংলায় ওঁর ওপর ডকুমেন্টারি হয়েছে, লেখালিখি হয়েছে। কিন্তু ওঁর যে বিশ্বাস,

সেটা নিয়ে পুরোপুরি কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। আমার গল্পের ভিত্তি কে সি পালের বিশ্বাস। শহরের দেওয়ালে উনি গত ৪০ বছর ধরে লিখে চলেছেন 'সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে'। ওঁকে নিজের বিশ্বাস থেকে একচুলও টলানো যায়নি। ছবিতে ওঁর চরিত্রের পাশাপাশি আরও দুই চরিত্র আছে। একজন বর্তমানে সুপারস্টার। একসময় বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসী। যে তার বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে এসেছে সহজে লক্ষ্যে পৌঁছতে। নাটকের শিক্ষকের মৃত্যুতে পৌঁছে যে দেখে, খুব সাধারণভাবে মারা গিয়েছে শিক্ষক। কিন্তু নীতিবোধে কোনও কম্প্রোমাইজ করেনি! কে সি পাল-কে দেখে এই সুপারস্টারের মনে প্রশ্ন জাগে, যখন সে তার বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে এল, তখন কীভাবে এই মানুষটি গত চল্লিশ বছর ধরে তাঁর বিশ্বাসের জায়গায় স্থির হয়ে রয়েছেন। তৃতীয় চরিত্রটি সুপারস্টারের একসময়ের বন্ধু এবং শিল্পী। ডিপ্রেশনে ভোগে। তার থেকে বাঁচতে কখনও দশ আঙুলে পাথর পরে। কখনও নামের বানান পরিবর্তন করতে চায়। তার বক্তব্য, নীতি আর বিশ্বাস আঁকড়ে অনেক ঠকেছি। এখন আর কিছু নয়। লড়াইটা শুধু কোনওভাবে বেঁচে থাকার। এই তিন চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের উত্তরণ নিয়েই গল্প এগোয়।' এরপর প্রশ্নটি হল কোন অভিনেতাকে দেখা যাবে, স্ট্রিট অ্যাস্ট্রোনমার কে সি পালের ভূমিকায়? অন্য দুই চরিত্রেই-বা থাকবেন কোন অভিনেতা? সেটা জানতে কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুটা! কাস্টিং আর ছবির গুরুত্বপূর্ণ হেঁশেলগুলো কে সামলাবেন সেই নিয়েই এখন কথা চলছে। অরিজিতের কথাতেই জানা যাচ্ছে, এই ছবির শ্যুটিং শুরু হবে আগামী বছরের গোড়ার দিকে। অন্তত তাঁরা আশা তেমনটাই!

দিন-রাত্রি হওয়ার কার— পৃথিবী তার নিজের অক্ষের উপর প্রতি ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ডে পশ্চিম থেকে পূর্বে একবার করে আবর্তন করে, তাই পৃথিবীর দিন-রাত্রি (১২ ঘণ্টা) হইয়া থাকে (চিত্র নম্বর ১১)

সূর্য ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাই পৃথিবীতে দিন-রাত্রি ছোট বড়, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশে দীর্ঘ ৬ মাস দিন-রাত্রি এবং ঋতু পরিবর্তন হইয়া থাকে (চিত্র ১৬, ১৮, ২২)।

কে সি পালের চ্যালেঞ্জ গোটা দুনিয়াকে
সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে
সংবাদ সোচ্চার, বর্ষ-৩, সংখ্যা-২০, ৩১ অক্টোবর ২০১৩, ১৩ কার্তিক, ১৪২৩

পৃথিবীর বিরলতম ঘটনার সাক্ষী হতে হলে এখনই চলে আসুন দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে। যেখানে গেলেই দেখা মিলবে অতিপরিচিত এক পাগলের। গোটা পৃথিবীর মানুষ এই মুহূর্তে যাকে নিয়ে হাসি-মস্করা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তাই রাত দিন হয়। যেখানে সূর্যকে পুরোটা প্রদক্ষিণ করতে তিনশো পয়ষোট্টি দিন লাগে। তাই বছর হয়। অথচ এই পাগল বিজ্ঞানীর মতে, সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে, কিন্তু বার্ষিক গতি নেই। সে কারণেই রাত-দিন হয়। আর ঋতু পরিবর্তন হয় সূর্যের বার্ষিক গতির জন্য। রাসবিহারীর মোড়ে ফুটপাথে একচিলতে জায়গা দখল করে চতুর্দিকে অজস্র পোস্টার ঝুলিয়ে রেখে চলছে সেই উদ্ভট তত্ত্বের প্রচার। যা নিয়ে কোনো মানুষের মাথাব্যথা আছে বলেও মনে হয় না। পুঁতিগন্ধময় অজস্র স্তুপাকৃত কাগজের মধ্যে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও তিনি করছেন এক অমানসিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। ফুটপাথের ধারে এক খণ্ড প্লাস্টিক সাঁটা চালাঘরে। ভিতরে কে? জিজ্ঞাসা করতেই উঁকি দেওয়ার ভঙ্গিতে বাইরে মুখ এনে বললেন আমি কে সি পাল। যাঁর পুরো নাম কার্তিকচন্দ্র পাল। কার্তিকবাবু এখানে কেন জিজ্ঞাসা করতেই তাঁর স্পষ্ট জবাব— সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, এই সত্যটা যতদিন না মানুষকে বোঝাতে পারবেন, ততদিন তিনি এভাবেই এখানে পড়ে থেকে তাঁর প্রচার চালিয়ে যাবেন। যদিও এই বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণ করতে তাঁর চেষ্টার কোনও খামতি ছিল না। যেখানে রেল, স্টেশন, শিয়ালদহ, হাওড়া সেতুতে দেওয়াল লিখন থেকে পোস্টার সাঁটা সবই

চলেছে দীর্ঘ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে। মিলিটারির এই প্রাক্তন কর্মীটি স্ব-ইচ্ছায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে গত কয়েক দশক ধরে লাগাতার প্রচার চালাচ্ছেন তাঁর বিশ্বাসের সমর্থনে। যাঁর তত্ত্বকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র নাসা প্রত্যাখ্যান করলেও তাতে তাঁর কিছুই যায় আসেনি। বরং এই বিষয়ে নাসার প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের ‘গাধা’ বলতেও তাঁর দ্বিধা নেই। যাঁকে এককথায় পাগল না উন্মাদ, কোনটা ভাবলে সঠিক হয় সেটা পথচলতি মানুষই বলবে। যাঁর কথায় পেনশনের পুরো টাকাটা তাঁর বউ নিয়ে নিচ্ছেন। ছেলেদের বাস আছে। যেখানে ১২/২/০২ হাওড়ার সারকুলার সিক্স লেনের নিজের বাড়ি থেকে একপ্রকার বিতাড়িত হয়ে এখানে বাসা বেঁধেছেন। বাড়ির কোনো সদস্যের সাথে কথা বলা যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই তাঁর আকুতি, এসব বিষয়ে ওদের বিরক্ত করবেন না। বোঝাই গেল, যে-বিশ্বাস নিয়ে তিনি দুনিয়া জোড়া তাবড় বিজ্ঞানীদের ভুল প্রতিপন্ন করতে চাইছেন, তাঁর সেই ধারণার সঙ্গী তাঁর নিজের পরিবারও হতে পারছেন না। যাঁরাই তাঁকে আর সবার মতোই এখন পাগল বলেই মনে করেন। যেটা বুঝেও ফুটপাথে রাত কাটানো ছিয়াত্তর বছরের এই প্রাক্তন সেনাকর্মী অলীক এক স্বপ্নের জাল বুনে চলেছেন। যাঁকে নিয়ে এই মুহূর্তে হাসির খোরাক করা ছাড়া আর কিছুই-বা ভাবা যায় না। ফুটপাথের সারমেয়রাই এখন তাঁর একমাত্র সঙ্গী।

পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, না সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে— এই ছোট প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অ্যারিস্টোটল দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, কোপারনিকাসের লেখা বই নিষিদ্ধ হয়েছিল। ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, গ্যালিলিওকে শেষ জীবনে কারাগারে বন্দি জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয়েছিল।